অধ্যায় - ২৭

বিষ্ণুসহস্র নাম প্রদান করে অনুগৃহীত করা, গীতা রহস্য, দাদাসাহেব খাপার্ডে।

এই অধ্যায়ে শ্রী সাইবাবা ধার্মিক গ্রন্থগুলিকে করস্পর্শ করে নিজের ভক্তদের পরায়ণের জন্য দিয়ে কি ভাবে তাদের অনুগৃহীত করতেন এবং অন্যান্য কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রারম্ভ ঃ-

জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে, সমুদ্রে স্নান করলে সমস্ত তীর্থ এবং পবিত্র নদীতে স্নান করার পুণ্য লাভ হয়। ঠিক এই রূপই সদ্‌গুরুর চরণের আশ্রয় নিলে তিনটি শক্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এবং পরমব্রহ্মকে প্রণাম করার মঙ্গলজনক ফল সহজেই পাওয়া যায়। শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজের জয় হোক্। তিনি তো ভক্তদের জন্য কল্পতরু, দয়ার সাগর ও আত্মানুভূতির দাতা। হে সাই! তুমি নিজের কাহিনী শ্রবণ করিয়ে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগাও। ঝমঝমে বৃষ্টিতে যেমন স্বাতী নক্ষত্রর কেবল এক বিন্দু জল পান করেই চাতক পাখী প্রসন্ন হয়ে যায়, সেই রকমই নিজের কথার সারসিন্ধুর একটি জল কণার সহস্রাংশ দিয়ে দাও, যার দ্বারা পাঠকগণ ও শ্রোতাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়ে আনন্দে ভরে উঠুক। শরীর হতে স্বেদ প্রবাহিত হোক, জলে চোখ ভরে যাক, প্রাণ স্থির হয়ে চিত্ত একাগ্র হয়ে যাক এবং ক্ষণে-ক্ষণে যেন দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে- এইরূপ সাত্বিক ভাব সবার মধ্যে জাগ্রত করে দাও। পারস্পরিক বৈমনস্য ও বর্গ-অপবর্গের প্রভেদ নষ্ট করে দাও। তাঁরা যেন তোমার ভক্তিতে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের শরীর কম্পন দেখা দেয়। যদি এইগুলি উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়, তাহলে সেগুলি গুরুর কৃপার লক্ষণই বোঝা উচিত। এই ভাবগুলি অন্তঃকরণে উদয় হতে দেখে গুরু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আপনাদের আত্মানুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল অন্যন্য ভাবে কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে যাওয়া। বেদ-বেদান্তও মায়ারূপী সাগর পার করাতে পারে না। এই কাজটি তো কেবল সদ্‌গুরুর দ্বারাই সম্ভব। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করার যোগ্য করে তোলার ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে।

স্পর্শপূত গ্রন্থ প্রদান ঃ-

গত অধ্যায়ে বাবার উপদেশ দেওয়ার বিচিত্র পদ্ধতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই অধ্যায়ে শুধু একটা উদাহরণই উল্লেখ করা হবে। ভক্তরা যে গ্রন্থ বিশেষটি অধ্যয়ন করতে চাইতেন, সেটি বাবার করকমলে অর্পণ করে দিতেন। বাবা যদি সেটি নিজের শুভ হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে ওরা সেটি স্বীকার করে নিতো। তাদের বিশ্বাস যে, যদি সেই গ্রন্থটি নিত্য পাঠ করা হয় তাহলে বাবা সর্বদা ওদের সাথেই থাকবেন। একবার কাকা মহাজনী একনাথী ভাগবৎ নিয়ে শিরডী আসেন। শামা বইটি নিয়ে মস্‌জিদে গেলেন পড়ার জন্য। পরে বাবা সেটি স্পর্শ করে কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে শামাকে বইটি ফেরত দিয়ে তাঁর কাছেই রাখতে বলেন। তখন শামা বাবাকে জানান- "এটি ত কাকাসাহেবের এবং ওঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।" বাবা বললেন, "না, না, এই বইটি আমি তোমাকে দিলাম। তুমি এটা সাবধানে নিজের কাছে রাখো। তোমার খুব কাজে লাগবে।" কিছুদিন পর কাকামহাজনী দ্বিতীয়বার শ্রী একনাথী ভাগবৎ এনে বাবার করকমলে অর্পণ করেন। বাবা প্রসাদ স্বরূপ ফিরিয়ে ওঁকেও সেটি সাবধানে সামলে রাখার আজ্ঞা দেন। তার সাথে-সাথে এও আশ্বাসন দেন, "এটি তোমায় চরম স্থিতিতে পৌঁছতে সাহায্য করবে।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে গ্রন্থটি গ্রহণ করেন।

শামা ও বিষ্ণুসহস্র নাম ঃ-

শামা বাবার অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাই বাবার ওঁকে এক বিচিত্র উপায়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' প্রসাদ রূপে দিতে ইচ্ছে হল। সেই সময় এক রামদাসী শিরডীতে এসে কিছুদিন ছিল। সে রোজ ভোরবেলা উঠে, হাত-মুখ ধোওয়ার পর স্নান করে গেরুয়া কাপড় পরে, শরীরে উদী মেখে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করত। তারপর করত অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ। বাবা শামাকে দিয়েও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ শুরু করাতে চাইতেন। এই সূত্রে উনি রামদাসীকে নিজের কাছে ডেকে বলেন, আমার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। সোনামুখী পাতার রস না খেলে আমার ব্যথা দূর হবে না।" রামদাসী তক্ষুনি নিজের পাঠ ছেড়ে বাজারের দিকে ছুটল। বাবা তখন নিজের আসন থেকে উঠে রামদাসীর আসনের কাছে গিয়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' পুস্তকটি উঠিয়ে আবার নিজের আসনে ফিরে আসেন। শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "ওহে শামা, এই বইটি খুবই নামী ও লাভদায়ক। তাই আমি তোমায় এটি দিচ্ছি, পড়ে দেখো। একবার আমি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। বুক ধড়ফড় করত- জীবন সংশয় হয়েছিল। সেই সময় আমি এই সদ্‌গ্রন্থটি নিজের বুকের উপর রাখি। কি যে সুখ পেয়েছিলাম! সেই সময় আমার

মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরিত হয়ে আমায় রক্ষা করলেন। তাই তোমায়ও দিচ্ছি। ধীরে-ধীরে, একটু-এটকু করে দিনে অন্ততঃ একটা শ্লোক অবশ্যই পড়ো। তোমার খুব মঙ্গল হবে।" তখন শামা বলেন- আমার এই বইয়ের কোন দরকার নেই - রামদাসী এক পাগল, জেদী ও অত্যধিক রাগী লোক। এক্ষুণি এসে অকারণেই ঝগড়া করতে শুরু করবে। এছাড়া আমি সংস্কৃত ভাষা তেমন জানিও না।" শামার ধারণা ছিল যে, বাবা তাঁর ও রামদাসীর মধ্যে মনোমালিণ্যতা সৃষ্টি করতে চান, তাই তিনি এই ধরনের নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু বাবার ওঁর প্রতি কি রকম (করুণার) ভাব ছিল, সেটা উনি বুঝতে পারেন না। বাবা যেন-তেন-প্রকারেণ বিষ্ণু সহস্র নামের মালা শামার গলায় পরিয়ে দিতে চাইছিলেন। তিনি তো নিজের এক অল্পশিক্ষিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করতে চাইছিলেন। **ঈশ্বর নাম জপের মাহাত্ম্য তো সবাই জানে। এটি আমাদের পাপ থেকে বাঁচিয়ে, কু-প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে। আত্মশুদ্ধির জন্য একটি উত্তম সাধন, যাতে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না আর এতে কোন নিয়মেরও বন্ধন নেই।** বাবা শুধু শামাকে দিয়ে এই সাধনাটি করাতে চাইতেন, কিন্তু শামা সে কথা বুঝতে পারছিলেন না। তাই বাবাকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে হয়। এই ধরনেরই একটি প্রসঙ্গ শোনা যায়- অনেক আগে শ্রী একনাথ মহারাজ, নিজের এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলে ওকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু সহস্র নাম জপ চিত্তশুদ্ধির জন্য এক শ্রেষ্ঠ এবং সরল পথ। রামদাসী বাজার থেকে তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে। আন্না চিঞ্চনীকর, 'নারদ মুনি' মতন উক্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত রামদাসীকে শোনান। রামদাসী রাগে শামার দিকে দৌড়য়, "এ তোমারই কাজ। তুমিই বাবাকে দিয়ে আমায় ওষুধ আনতে পাঠালে। বইটা ফেরত না দিলে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবো।" শামা শান্ত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ওঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বাবা স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন- "আরে রামদাসী, একি কথা? উপদ্রব কেন করছ? শামা কি আমাদের আপন লোক নয়? তুমি ওকে মিছিমিছি কেন গাল দিচ্ছো? তুমি এত ঝগড়াটে হলে কি করে? একটু নম্র ও মৃদুভাষী হতে পারো না? তুমি রোজ এই পবিত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করো, তবুও তোমার চিত্ত অশুদ্ধ। তোমার ইচ্ছাই যখন তোমার বশে নেই, তখন তুমি কি ধরনের রামদাসী তোমার তো সমস্ত বস্তু থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। এই বইটির প্রতি এত মোহ কেন? আশ্চর্যের কথা! সত্যিকারের রামদাসী তো সে, যে মমতা ত্যাগ করে সমদর্শী হতে পারে। তুমি তো শামার সাথে একটা ছোট্ট বই নিয়ে ঝগড়া করছ। যাও গিয়ে

নিজের আসনে বসো। টাকা দিয়ে তো বই অনেক পাওয়া যেতে পারে, মানুষ পাওয়া যায় না। মনে উত্তম বিচার রেখে বিবেকবান হও। বইয়ের দামই বা কত? শামার সেটার কি প্রয়োজন? আমি স্বয়ং সেটি তুলে শামাকে দিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম তোমার তো এটি কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। তাই শামাও এটি পাঠ করে কিছু লাভ পাক, তাই তাকে দিয়েছিলাম।" বাবার এই শব্দগুলি কত মধুর, মার্মিক ও অমৃততুল্য। এর প্রভাব রামদাসীর উপরও পড়ে। ও একেবারে শান্ত হয়ে যায় এবং তারপর শামাকে বলে- "আমি এর বদলে পঞ্চরত্নী গীতা নেব।" তখন শামাও খুশী হয়ে বলেন- "একটা কেন, আমি তো তোমাকে এটির বদলে ১০টা দিতে রাজী আছি।" এই ভাবে এই বিবাদটি শেষ হয়। কিন্তু এবার এই প্রশ্ন ওঠে যে, রামদাসী পঞ্চরত্নী গীতার (এমন একটি পুস্তক যার বিষয় ওর কখনো খেয়ালই হয়নি) জন্য এত আগ্রহান্বিত হল কেন? মস্‌জিদে যে রোজ ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করত, সে বাবার সামনে এত উৎপাত কিভাবে করল? আমরা জানি না এই দোষের নিরাকরণ কিভাবে করা যেতে পারে এবং দোষী কে? আমরা শুধু এতটাই জানি যে যদি এই প্রণালীটি অনুসরণ না করা হতো তাহলে বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং ঈশ্বর নামের মহিমা ও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠের সু-ফল সম্পর্কে শামা অনভিজ্ঞ রয়ে যেতেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা এটাই বুঝতে পারা যায় যে, বাবার উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি এবং তাঁর কার্যকলাপ ছিল অদ্বিতীয়। শামা ধীরে-ধীরে এই গ্রন্থটির এতটা অধ্যয়ন করেন এবং এমন ভাবে এটি রপ্ত করে নেন যে, শ্রীমান বুটী সাহেবের জামাই, প্রোফেসর জি.জি. নারকেকেও (এম.এ., ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, পুণে) তার যথার্থ অর্থ বোঝাতে সম্পূর্ণ রূপে সফল হন।

গীতা রহস্য ঃ-

যারা ব্রহ্মবিদ্যার (আধ্যাত্ম) অধ্যয়ন করত, বাবা তাদের সব সময় উৎসাহিত করতেন। একবার বাপুসাহেব জোগ একটা পার্শেল পান। তার মধ্যে শ্রী লোকমাণ্য তিলক কৃত 'গীতা রহস্য'-এর একটি একটি কপি ছিল। উনি সেটা বগলে দাবিয়ে মস্‌জিদে আসেন। চরণ বন্দনা করার জন্য ঝুঁকতে গিয়ে পার্শেলটি বাবা শ্রী চরণের উপর পড়ে যায়। তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "এতে কি আছে?" শ্রী যোগ তক্ষুনি বইটি বার করে বাবার করকমলে রেখে দেন। বাবা কিছুক্ষণ ওর কয়েকটি পাতা উল্টে দেখেন। তারপর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে সেটি বইটির উপর রেখে জোগকে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন- "এইটি মন দিয়ে পড়ো, তোমার কল্যাণ হবে।"

শ্রীমান এবং শ্রীমতি খাপার্ডে ঃ-

এক সময় শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে সপরিবারে শিরডী আসেন এবং কয়েক মাস সেখানেই থাকেন। ওঁর অবস্থানের নিত্য কার্য্যক্রমের বর্ণনা 'শ্রী সাইলীলা' পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। দাদা সামান্য লোক ছিলেন না। উনি অমরাবতীর (বরার) সুপ্রসিদ্ধ ও ধনশালী উকিল ছিলেন। উনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং বিধান সভার সদস্য ছিলেন। তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন এই ভদ্রলোক উচ্চ স্তরের বক্তা হিসেবে যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এত গুণবান হওয়া সত্ত্বেও বাবার সামনে মুখ খোলার ওঁর সাহস হতো না। অনেক ভক্তই বাবার সঙ্গে কথা বলতেন ও যুক্তি-তর্কও করতেন। শুধু তিনটি ব্যক্তি-খাপার্ডে, নূলকর ও বুটীসাহেব সবসময় মৌন থাকতেন। ওঁরা অতি বিনম্র, ভদ্র ও মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন। দাদা সাহেব বিদ্যারণ্য স্বামীর দ্বারা রচিত পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থর (অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক) বিবরণ অন্যদের বোঝাতেন। কিন্তু যখন বাবার সামনে মস্‌জিদে আসতেন, তখন একটা শব্দও উচ্চারণ করতেন না। আসলে যে যতই বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হোক না কেন, ব্রহ্মাপদে স্থিত ব্যক্তির সামনে ওর শুষ্ক জ্ঞান আলোকপাত করতে পারে না। দাদা চার মাস ও ওঁর স্ত্রী সাত মাস শিরডীতে ছিলেন। ওঁরা দুজনেই শিরডী অবস্থানে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন। শ্রীমতি খাপার্ডে ছিলেন শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমতি মহিলা। ওঁর শ্রী সাইয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ছিল। প্রতিদিন দুপুরে নিজে নৈবেদ্য নিয়ে মস্‌জিদে যেতেন। বাবা সেটা গ্রহণ করলে, তবে ফিরে এসে নিজে আহার করতেন। বাবা অন্যদেরও শ্রীমতি খাপার্ডের অটল শ্রদ্ধার ক্ষণিক দর্শন করাতে চাইতেন। একদিন দুপুরে উনি সুজির পায়েস, লুচি, ভাত, পাঁপড় এবং অন্যান্য ভোজ্য পদার্থ নিয়ে মস্‌জিদে আসেন। অন্যান্য দিন বাবার প্রতীক্ষায় খাবার পড়ে থাকত। কিন্তু সেদিন তিনি তক্ষুনি উঠে খাবারের জায়গায় আসন গ্রহণ করেন। থালার উপর থেকে কাপড় সরিয়ে সানন্দে খাবার খেতে শুরু করে দেন। তখন শামা বলেন- "এই পক্ষপাতিত্বের কারণ টি কি? অন্যদের থালার দিকে তো আপনি ফিরেও তাকান না বরং কখনো-কখনো সেগুলি সরিয়ে দেন। কিন্তু আজ আপনি খুবই উৎসুক ও খুশী হয়ে খাচ্ছেন। আজ এই মায়ের খাবার আপনার এত সুস্বাদু কেন লাগছে? বড়ই বিচিত্র ব্যাপার তো!" তখন বাবা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাপারটা বোঝান-

"সত্যি এই ব্যাপারটা বিচিত্র। পূর্বজন্মে এই মহিলাটি এক ব্যবসায়ীর গরু ছিল এবং প্রচুর দুধ দিত। পশুযোনি ছেড়ে এ এক মালীর বাড়ীতে জন্ম নেয়। ঐ জন্মের

পর এক ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্ম নিয়ে বিয়ে করল এক ব্যবসায়ীকে। দীর্ঘকাল পর এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এর থালা থেকে চারটি গ্রাস খেয়ে নিতে দাও।" এই বলে বাবা পেট ভরে খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে, তৃপ্তির চার-পাঁচটা ঢেকুর তুলে নিজের আসনে এসে বসেন। শ্রীমতি খাপার্ডে বাবাকে প্রণাম করে তাঁর চরণ সেবা করতে লাগলেন। বাবা ওঁর সাথে গল্প করতে শুরু করেন এবং সাথে-সাথে ওঁর হাতও টিপতে থাকেন। পরস্পরের এই সেবা দেখে শামা হেসে বলেন- "দেখো তো, এ কি অদ্ভুত দৃশ্য। ভগবান আর ভক্ত একজন অন্য জনের সেবা করছেন।" শ্রীমতি খাপার্ডের কপটহীন উৎসাহ দেখে বাবা অত্যন্ত নরম ও মৃদু শব্দে বলেন- "এবার থেকে সর্বদা 'রাজারাম-রাজারাম' মন্ত্রের জপ কোর। যদি তুমি এর নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। শান্তি পাবে, অত্যধিক লাভ হবে।" আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরা এটিকে একটি অতি সাধারণ ঘটনা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের ভাষাতে এটিকে 'শক্তিপাত' বলা হয় অর্থাৎ গুরু দ্বারা শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা। বাবার শব্দগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, এক মুহূর্তে মহিলাটিকে প্রভাবিত করে ওঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে যায় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি গুরু ও শিষ্যর সম্বন্ধের আদর্শের দ্যোতক। গুরু ও শিষ্য দুজনেই একে-অন্যকে অভিন্ন জেনে একজন-অন্যজনকে প্রেম ও সেবা করেন কারণ ওঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। তাঁরা দুজনে অভিন্ন এবং একই, একে-অন্যকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। শিষ্য গুরুদেবের চরণতলে-মাথা নত করছেন- এতো শুধু বাহ্য দৃশ্যমাত্র। আন্তরিক দৃষ্টিতে এরা দুজনে অভিন্ন এবং এক। তাঁদের মধ্যে যে ভেদ দেখে, সে এখনো অপরিপক্ক এবং অপূর্ণ।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।